১৫

প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০০৫

এক ইংরেজের দ্বিতীয় বিবাহ এবং র‍্যাব

এ জেড এম আবদুল আলী

এক ইংরেজ দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে তার এক বন্ধুর মন্তব্য ছিল, Yet another example of hope's victory over experience (এটি অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে আশার জয়ের আরেকটি উদাহরণ)। সন্ত্রাস দমনে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের র‍্যাব নামানোটাও প্রায় ওই রকমই– অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে আশার জয়। অভিজ্ঞতা সরকারের হয়েছিল এক বছর আগে 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' করেই। সেবারের বিয়েটা টেকেনি। মানে সন্ত্রাস কিছু দিনের মতো গা ঢাকা দিলেও দমন হয়নি। কিন্তু সেই দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাওয়া মানুষটির মতো আশা ছাড়তে পারেনি সরকার। তাই এবার নামানো হয়েছে র‍্যাব (র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন)। আর কিছুই বদলায়নি অবশ্য। শুধু বাহিনীর নাম এবং হত্যার অজুহাতের নাম বদলেছে। আগেরবার যে বাহিনীকে এই কাজ দেওয়া হয়েছিল তারা ছিল নির্ভেজাল সেনাবাহিনী। এবার সেখানে মিশ্রবাহিনী গঠন করা হয়েছে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। সেবারে মানুষ হত্যা করে বলা হতো তারা 'হার্ট অ্যাটাকে' মারা যাচ্ছে, এখন বলা হচ্ছে তারা 'ক্রসফায়ারে' মারা যাচ্ছে।

'ক্রসফায়ারে'র পক্ষে বা বিপক্ষে যারা বলছে বা লিখছে তারা সবাই জানে যে, হার্ট অ্যাটাকের অজুহাতটি তখন যেমন মিথ্যা ছিল, ক্রসফায়ারের অজুহাতটিও এবার তেমনি একটি মিথ্যা অজুহাত। যারা মারা যাচ্ছে তাদের ঠাণ্ডা মাথায় মেরে ফেলা হচ্ছে। অবশ্য এতে সেই আমেরিকান অজুহাত 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ'-এর (বোমাবর্ষণে বেসামরিক মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির মার্কিন নাম) ফলে শিশু মাইশা বা রায়েরবাজারের সেই ৬০ বছরের বৃদ্ধের মতো কিছু লোক মারা যাচ্ছে অথবা ডিওএইচএসে সেনাবাহিনীর সেই অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সাহেবের বাড়ির দরজা-জানালা ভাঙচুরের মতো কিছু ঘটনা ঘটছে। তবে তা যদি ঘটেই থাকে, ঘটুক না। সন্ত্রাস তো দমন হচ্ছে, মানুষ তো শান্তিতে ঘুমাতে পারছে। অবশ্য যারা র‍্যাবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা কখনো জিজ্ঞেস করছে না যে, এমন একটি ভালো জিনিস দেশে হচ্ছে, দেশের সরকারি বাহিনী করছে, তাতে অযথা মিথ্যা অজুহাত ব্যবহার করা হচ্ছে কেন? সরকার পরিষ্কার ও স্পষ্ট বলে দিলেই পারে, এই বাহিনীকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যাদের হত্যা করাটা উচিত বলে মনে করে, ইচ্ছে করলে তাদের হত্যা করতে পারে। অনেক শিক্ষিত লোক, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকও এ হত্যা সমর্থন করছে। প্রশ্ন এখানেই। যারা বলছে যে দেশে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, তারা কোন উপাত্তের ভিত্তিতে বলছে এসব কথা। এমন কোনো তুলনামূলক পরিসংখ্যান আমার চোখে পড়েনি, যা আমাকে নিশ্চিত করতে পারে যে, সত্যি দেশে সন্ত্রাস একেবারে কমে গেছে। আমাদের পাড়াতেই গোটাতিনেক ছিনতাইয়ের ঘটনা আমি জানি, যা এক মাসের মধ্যে ঘটেছে। এ-ও জানি, একটি দম্পতি, যাদের সবকিছু ছিনতাই হয়ে গেছে সন্ধ্যা ৭টার সময়, তারা পুলিশ-র‍্যাব কারো কাছে যায়নি। কারণ তারা জানে, ফল তো কিছু হবেই না উল্টো তারা প্রতিহিংসার শিকার হবে। সেই দম্পতির মেয়েটি তো আমাকে এ কথাও বলেছে যে, যারা সেদিন সন্ধ্যায় তার রিকশা থামিয়ে ব্যাগ কেড়ে নিয়েছিল তাদের সে চিনতে পেরেছে এবং প্রায়ই অফিসে যাওয়ার সময় সে তাদের মধ্যে দু-একজনকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প করতে দেখে। আমি তাকে এ বিষয়ে আর মুখ না খুলতে বলেছি। দুটি কারণে এ কথা বলেছি আমি। প্রথমত, সে দিনের আলোয় এখন যাদের দেখছে তারাই যে ছিনতাইকারী ছিল এমনটি ঠিক নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ওই ছেলেগুলো বড়লোকের বখাটে ছেলে (ওরা গাড়ি করে সামনে এসে ওর রিকশা থামিয়েছিল)। ওদের টিকি ছোঁয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। এ রকম কত জায়গায় হচ্ছে কে জানে। সন্ত্রাস যদি একটু আধটু কমেও থাকে তা ফিরে আসতে বেশি দেরি হবে না। বেশ কয়েকটি সামরিক আইন জারির অভিজ্ঞতা থেকেইএ কথা বলা যেতে পারে। প্রথম প্রথম মিলিটারিরা রাস্তায় নামার পরপরই সবাই চুরি, ঘুষ ও ছিনতাই বন্ধ করে দেয়। কিন্তু কয়েক দিন পর যখন সবকিছু একটু ঢিলেঢালা হয়ে আসে, তখনই আবার 'যথা পূর্বং তথা পরং'। বরঞ্চ একটু জোরেশোরেই আবার তা ফিরে আসে– এই তো আমাদের অভিজ্ঞতা। সামরিক আইন যেমন আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত পুলিশ বা অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর বিকল্প হতে পারে না, তেমনি র‍্যাব, চিতা-বোকরা এগুলোও কোনো নিয়মিত প্রতিষ্ঠানের বিকল্প হতে পারে না। এগুলো একেবারেই সাময়িক মলম লাগানোর মতো ব্যবস্থা। এ জন্যই বোধ হয় বলা হয়, 'You can do everything with a bayonet except sit on it'। (আপনি বেয়োনেট দিয়ে সব কিছুই করতে পারেন, শুধু এর ওপর বসা ছাড়া)।

কেউ কেউ বলছেন সন্ত্রাসের ধরন বাংলাদেশে যে রকম তাতে বিদেশী ফর্মুলা দিয়ে তা দূর করা যাবে না। জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা কি বিদেশী ফর্মুলা? আমাদের সংবিধান কি বিদেশী ফর্মুলা? একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক যখন এ ধরনের কথা বলেন তখন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেও দুর্ভাবনা হয়। আমাদের সংবিধান তো এখনো স্থগিত করা হয়নি। সেটি কি পড়ানো হচ্ছে না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে? বলা হচ্ছে, আমেরিকা-ব্রিটেন আফগানিস্তান ও ইরাকে যা করছে তারপরও আমরা তাদের সমারোচনা গ্রহণ করব কেন? সমালোচনা না হয় প্রত্যাখ্যান করলাম, তাই বলে তারা যা করছে আমরাও তাই করব? ইউরোপ বা জাপান কি আমাদের র‍্যাবের কর্মকাণ্ডে খুশি হচ্ছে বা অপারেশন ক্লিনহার্টের সমর্থন করেছিল? অন্যের সমালোচনার কথা না হয় বাদই দিলাম, আমাদের নিজের বিবেক বা অভিজ্ঞতাই বা কী বলে? যে দলের প্রধান দপ্তরে বোমা বানাতে গিয়ে মানুষ নিহত হয়, তারা সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে কতখানি আন্তরিক তা কি ভেবে দেখেছি আমরা? যে দল সরকার গঠন করেই ৭০ হাজার বিচারাধীন আসামিকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দিয়ে দেয়, তারা র‍্যাব

গঠন করে ২০০-৩০০ সন্ত্রাসী হত্যা করে সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করবে– এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? মাঝখানে তারা এ কাজ করে দেশের বিচারব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগের প্রতি যে অনাস্থা প্রকাশ করল, তা কি আমাদের শিক্ষিত সমাজ যারা র‍্যাবের প্রশংসায় মুখর, তাদের চোখ এড়িয়ে গেল? বেশকিছু দিন আগে কাগজে দেখেছি, খুলনায় এক সন্ত্রাসীকে এভাবে হত্যার পর তার স্ত্রী এবং ভাই পরদিন একটি সংবাদ সম্মেলন করে কোন কোন গডফাদার তার স্বামী এবং ভাইকে সন্ত্রাসী বানিয়েছে তাদের নাম ঘোষণা করার কথা বলে। পরদিন পুলিশ ও প্রশাসন সেই বাড়ি ঘিরে রেখে তাদের বাড়ি থেকেই বের হতে দেয়নি। খুলনার এরশাদ শিকদারকে গ্রেফতার করার পর যে তদন্ত রিপোর্ট করা হয়েছিল তা কি কখনো প্রকাশ করা হয়েছে? এসব কি সন্ত্রাস দমনে সরকারের আন্তরিকতার লক্ষণ? এত তুখোড় বাহিনী আজও বাংলা ভাইকে ধরতে পারেনি। এর কারণ কি এই যে, তারা নিজেদের একটি ইসলামী সংগঠন বলে দাবি করে? এবং সরকারে তাদের দল বর্তমানে ক্ষমতায়?

আমাদের আইনমন্ত্রী প্রায়ই একটা কথা বলে থাকেন, আইন তার নিজের গতিতে চলবে? পৃথিবীর কোনো দেশে এ রকম আইন কি আছে, যেখানে দিনের পর দিন এভাবে 'এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং' চলতে দেওয়া হয়? এই যে বলা হচ্ছে যে, ধৃত সন্ত্রাসীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধার বা তার সঙ্গীদের ধরার সময় র‍্যাব আক্রান্ত হচ্ছে এবং সেখানে তাদের সঙ্গে গোলাগুলির ফলে ক্রসফায়ারে ধৃত সন্ত্রাসী মারা যায়। একজন সন্ত্রাসীকে ধরার পর তার সাঙ্গপাঙ্গরা পুলিশ বা মিলিটারির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য তাদের পুরনো আস্তানায় লুকিয়ে থাকে– এ রকম ঘটনা পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট সন্ত্রাসপীড়িত দেশ কলম্বিয়াতেও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। অথচ বাংলাদেশে এ ঘটনাই ঘটছে আজ মাস দুয়েক ধরে প্রতিদিন। আমরা দুর্নীতিতে প্রথম হয়ে যাচ্ছি নিয়মিতভাবে। এবার আমরা মিথ্যাবাদিতায়ও প্রথম হব বলে সংকল্প করেছি কি?

আমি প্রচণ্ডভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। র‍্যাব নামে যে 'ডেথ স্কোয়াড' গঠিত হয়েছে তা আজ কী করছে বা আগামীতে কী করবে– তা নিয়ে নয়, এত লোক যখন র‍্যাব সমর্থন করছে তখন এই-ই বোধ হয় আমাদের প্রাপ্য। আমার চিন্তাটা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে। ইংরেজি প্রবাদ মনে আসছে। শিক্ষকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, একজন শিক্ষক অনন্ত কালকে স্পর্শ করে (A teacher touches eternity)। আমাদের দেশের আজকের ছাত্ররা কি অনন্তকাল ধরে এ কথাই শিখবে যে, একটি দেশের সংবিধানকে ইচ্ছে করলে গ্রাহ্য না করলেই চলে বা জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা একটি মূল্যহীন দলিল? ডিসেম্বর মাসটি বাংলাদেশের জয়ের মাস। ডিসেম্বর মাসটিতেই ঘোষিত হয়েছিল জাতিসংঘের সেই অমূল্য দলিল। আর এই মাসেই কিনা আমাকে মেনে নিতে বলা হচ্ছে এ রকম ভয়ঙ্কর একটি কথা।

এ জেড এম আবদুল আলী: অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা

১৬

প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি ২০০৫

ক্রসফায়ারের গল্প এবং খুনের সারি

আনু মুহাম্মদ

আমরা জানি, গোয়েবলসও বলেছিলেন, মিথ্যা বরাবর বলতে বলতে তা একসময় 'সত্য' হয়ে যায়। সরকারি ক্রসফায়ারের গল্প বা মিথ্যাচারের ক্ষেত্রে তা হয়নি। দিনে দিনে সবাই বুঝতে পারছেন ক্রসফায়ার একটি রেকর্ড করা গল্প। একটা মিথ্যাচার। কতজন খুন হলেন এ পর্যন্ত? পত্রিকার হিসাবে প্রায় দেড় শ। পত্রিকার খবরের বাইরে হয়তো আরো বেশি।

র‍্যাব ধরে ধরে 'সন্ত্রাসী' খুন করছে, এটাই সকলের ধারণা। ঠিক এতটুকু বুঝে হয়তো অনেকে খুশিও। বিচার-আদালত সব কোথায় গেল তা নিয়ে দেশী-বিদেশী মাথাওয়ালাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কী রকম নির্বোধের জগৎ তৈরি হয়েছে এ দেশে, তা এ থেকে বোঝা যায়। সংবাদপত্রের বর্ণনায়, পুলিশ বা র‍্যাবের ভাষ্যে সব খুনের অপরাধ ঢাকা পড়ে যায় নিহতের নামের সঙ্গে 'সন্ত্রাসী' যোগ করলেই। বলে দিলেই হলো তার নামে খুনের মামলা আছে। কোনো মানুষকে পুড়িয়ে মারলেও যেন সমাজ তা গ্রহণ করে নেয়, যদি নিহতের পরিচয়ের সঙ্গে সন্ত্রাসী শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়। ঢাকা শহরে গত এক বছরে বেশ কয়েকজন তরুণ গণপিটুনিতে মারা গেছে। পত্রিকায় খবর এসেছে তারা সন্ত্রাসী ছিল। পুলিশও সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

এই গণপিটুনি আসলে কতটা 'গণ' ছিল আর কতটা কোন গ্রুপের পরিকল্পিত ছিল, তা কেউ নিশ্চিত বলতে পারে না, কেউ যেন জানতেও চায় না। এই 'গণ'পিটুনির অধিকতর ভয়ঙ্কর চেহারা প্রকাশিত ঢাকাতেই– যখন মানুষের সামনে, পুলিশের জানামতেই মেরে জখম করার পর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় কতিপয় যুবককে। পত্রিকায় খবর আসে, তারা সন্ত্রাসী ছিল। এই শব্দটাই যথেষ্ট সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকে সরকার এবং বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনকে রক্ষা করতে। পিটিয়ে মারা, পুড়িয়ে মারা, ছুরি দিয়ে মারা সবকিছু তাই এক হিসেবে বৈধতা লাভ করেছে। খুনি 'গণ' হতে পারে, 'বাংলাভাই' হতে পারে, হতে পারে পুলিশ কিংবা র‍্যাব-চিতা-কোবরা! যারা খুন হচ্ছে তাদের পক্ষে কোনো কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের কী বলে মারা হলো, তারা কাদের ক্রোধের শিকার হলেন। হলে খুন হয়ে যাওয়া 'সন্ত্রাসী'দের কাছ থেকে আমরা জানতে পারতাম কেন তাদের ঘনিষ্ঠজনরা, সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকেরা কিংবা তাদের বড়ভাই-বস-ওস্তাদরা তাদের সরিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হতে পারে নিয়ন্ত্রণ পুরো নেই, হতে পারে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হয়েছে।

কিংবা নতুন ছকে তাদের জায়গা নেই। কিংবা বড় কোনো পরিকল্পনার ক্ষেত্র তৈরিতে তাদের বলি হওয়া দরকার।

শুধু কি সন্ত্রাসী হিসেবে মামলা বা অভিযোগ থাকলেই খুন হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে? না, এখন শুরু হয়েছে 'চরমপন্থী' নিধন। কোনো এককালে এ রকম রাজনীতি করতেন, বহু আগে ছেড়ে কৃষিকাজ বা শিক্ষকতা করছেন এ রকম মানুষও বাদ নেই। 'বাংলাভাই'রা যাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালিয়েছিল, সরকারি বাহিনী এখন তাদেরই খুঁজতে ও মারতে বেরিয়েছে। 'চরমপন্থী' বলে পরিচিতদের মধ্যে ক্ষমতাবানদের লাঠিয়ালও কম নেই।

আমি যখন এই লেখা লিখছি, তখন আমার সামনে 'ক্রসফায়ারে' দেশের প্রবীন বামপন্থি (চরমপন্থি বলে কথিত) নেতা মোফাক্করুল ইসলাম চৌধুরীর নিহত হওয়ার খবর এবং লাশের ছবি। তার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি। তাকে আমি ভালো করে জানিও না। তার রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা আছে কিন্তু তার ভাষ্য মৌখিকভাবে জানার কোনো সুযোগ কখনো হয়নি বা লিখিতভাবে তার চিন্তাধারা জানার সুযোগও সেভাবে ঘটেনি। তিনি আত্মগোপনে ছিলেন এবং তার দলীয় কাজও ছিল গোপন। তিনি সমাজের *বিপ্লবী* রূপান্তরের জন্য নিবেদিত ছিলেন, এটা নিঃসন্দেহ। কী পদ্ধতিতে এই *বিপ্লবী* রূপান্তর ঘটতে পারে, সে নিয়ে তার মতের যতটুকু জানি তাতে তার সঙ্গে মিলের জায়গা খুবই কম। বহু বিষয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও এ কথাটি জোরের সঙ্গেই বলতে হবে যে, তিনি এই সমাজের সেই ক্ষুদ্র অংশ মানুষের একজন, যারা ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবন যাপন করেন না, যারা মহৎ সামষ্টিক জীবনের মহৎ রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেন এবং তার জন্য নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী কাজ করেন।

'শ্রেণীশত্রু খতমের' একটি লাইন এ দেশে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল ষাটের দশকের শেষে। *বিপ্লবী* আন্দোলনের পথ হিসেবে জনগণের শত্রু খুনি লুটেরা নির্যাতকদের শারীরিকভাবে খতম করা বহু পুরনো লাইন এবং বিশ্বের বহু অঞ্চলে এর উপস্থিতি দেখা গেছে। এই লাইনের বিকাশ ঘটে তখনই যখন সমাজে অসহনীয় পরিস্থিতির পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিছু দুর্বৃত্ত-বাটপার খুন করে *বিপ্লব* করার দৃষ্টিভঙ্গিকে বিরোধিতা করেই মার্কস এঙ্গেলস *সমাজ বিপ্লবের* নতুন দিশা আমাদের সামনে উপস্থিত করেন। সবগুলো *সফল বিপ্লবের* ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি ব্যক্তিহত্যা বা নৈরাজ্যিক বা হঠকারী দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে এসে *বিপ্লবীরা* নতুন যাত্রাপথ শনাক্ত না করা পর্যন্ত এক দুষ্ট বৃত্ত থেকে বের হওয়া সম্ভব হয়নি। রাশিয়ায় লেনিনের বড় ভাই নিজেই জারকে হত্যা করতে জীবন দিয়েছিলেন। এই ত্যাগের মহিমা কম নয় কিন্তু এই ত্যাগ দিয়ে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না; এবং অনেক ক্ষতি হয়। সেজন্য লেনিন জারকে হত্যা করতে তার জীবন ব্যয় করেননি, জারতন্ত্র ও শোষণতন্ত্র সম্পর্ক উচ্ছেদ করতে যে ধরনের সংগঠন ও রাজনীতি দরকার, তার বিকাশ ঘটিয়ে রাশিয়াকে মুক্ত করেছিলেন হাজার বছরের শৃঙ্খল থেকে; আর বিশ্বের মানুষের সামনে উপস্থিত করেছিলেন *বিপ্লবী* রাজনীতির কার্যকর পথ। চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কিউবা–সর্বত্রই লড়াইয়ের প্রধান মাধ্যম ছিল জনগণ ও সংগঠন। এসব কোনো ক্ষেত্রেই ব্যক্তিহত্যার লাইন ছিল না।

ব্যক্তি যদি দুষ্ট হয়, যদি নির্যাতক হয় তবে তাকে হত্যা করে লাভ হয় না কেন? লাভ হয় না এ কারণে যে, ব্যক্তি সার্বভৌম নয়, ব্যক্তি সর্বশক্তিমান নয়, ব্যক্তি সমাজস্রষ্টা নয়; সুতরাং ব্যক্তির অপসারণে সাময়িক আরাম হতে পারে কিন্তু অচিরেই সব উপাদান আবার মানুষকে তাড়া করতে থাকে। শোষণমূলক ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে একদিকে মালিকানা ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে মতাদর্শিক সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর। সমাজ রূপান্তর মানে এর সবকিছুর রূপান্তর বোঝায়। গ্রামসি পরে আরও পরিষ্কার করেছেন মার্কসীয় এই মৌল প্রস্তাবনা যে, অন্যান্য লড়াইয়ের সঙ্গে মতাদর্শিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে এবং পাল্টা মতাদর্শ নির্মাণ ও তার আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়েই মুক্তির লড়াই অগ্রসর হতে পারে।

পাল্টা মতাদর্শ মানে এক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে নতুন জীবন ও সমাজের স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা অর্জন। এই ক্ষমতাই মানুষের সক্রিয়তা তৈরি করে নতুন সমাজ নির্মাণের। এই স্বপ্নই মানুষকে অন্য মানুষের জন্য, ভবিষ্যতের অজানা সমাজের জন্য জীবন বাজি রাখতে ক্ষমতা জোগায়। অসংখ্য মানুষের জমায়েত যে অপ্রতিরোধ্য শক্তি সৃষ্টি করে, তাকে খুন করে শেষ করা যায় না। মোফাক্কর চৌধুরী তাই মার্কসের বা লেনিনের বা মাওয়ের পথে চলেছেন এটা বলা যাবে না। কিন্তু তিনি এক উচ্চতর মানবিক সমাজের স্বপ্ন নিয়ে নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন। সেজন্যই তাকে আদালতে মোকাবিলার সাহস করেনি রাষ্ট্র।

মোফাক্কর চৌধুরীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগের কথা সরকার বলেনি। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলার খবরও র‍্যাব বা পুলিশ দিতে পারেনি। পুলিশের তালিকা অনুযায়ী তিনি তাই সন্ত্রাসী নন। আরো অনেক কিছুই তিনি নন। তিনি যুদ্ধাপরাধী নন, তিনি ব্যাংক-লুটেরা নন, ঠক নন, নারী নির্যাতক কিংবা যৌন ব্যবসায়ী নন; তিনি দেশের সম্পদ অন্যের হাত তুলে দেওয়ার জন্য, দেশের ভেতর দেশী বা বিদেশী দখলদারদের রাজত্ব কায়েমে সর্বশক্তি নিয়োগ করেননি। এ ধরনের কাজের কৃতিত্ব যাদের আছে, তাদের সবাইকে বর্তমান সরকারে, সরকারের ভেতরে ও আশপাশে পাওয়া যাবে। রাষ্ট্রীয় বাহিনী এদেরই সম্প্রসারণ। সেজন্য এখন 'সন্ত্রাস দমন' অভিযানের বস হলো লাখো খুনের অপরাধে যুদ্ধাপরাধী, ১০ ট্রাক অস্ত্রের চোরাচালানি, দখল-সন্ত্রাস-লুণ্ঠনের মালিক, বেআইনি ব্যবসায়ী ম্যাগনেট।

দেশে 'উন্নয়ন' হচ্ছে এখন অনেক রকম। সরকার বিশ্বব্যাংককে দায়মুক্তি দেওয়ার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তাদের সেনাবাহিনীর লোকজন বাংলাদেশে যা খুশি করতে পারবে, তার জন্য কোনো বিচার বাংলাদেশের মাটিতে হবে না। বাংলাদেশ বাহিনীরই বা কেন তবে বিচার থাকবে? ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তোর বাহিনী, ইরানের শাহানশাহর সাভাক কিংবা চিলির পিনোচেটের গুপ্ত প্রকাশ্য ঘাতক বাহিনী এরকমই বিচারের উর্ধ্বে ছিল। এসব বাহিনীই মার্কিনীদের খুবই প্রিয় ছিল, আছে। যেসব শাসকগোষ্ঠী দেশ লুণ্ঠনে দখলে আর মানুষের স্বপ্নসম্ভাবনা বিনষ্টিতে সক্রিয়, তাদের সবার জন্যই এ রকম বাহিনী খুব প্রিয়, খুব দরকার। তার একটা ক্ষেত্রই কি বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে?

আনু মুহাম্মদ: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়